সংবিধান সংস্কার কমিশন

ব্লক-১, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে অফলাইনে প্রকাশিত সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং অন্যান্য সংস্কার কমিশন সংক্রান্ত সংবাদ:

ক্র.নং	সংবাদ শিরোনাম	পত্রিকার নাম	মন্তব্য
১.	**মতামত: ন্যূনতম সংস্কার কর্মসূচির একটি নকশা**	দৈনিক প্রথম আলো	পৃষ্ঠা: ০৮
২.	**হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ আদেশ: অন্তর্বর্তী সরকার আইনি দলিল ও জনগণের ইচ্ছা দিয়ে সমর্থিত**	দৈনিক প্রথম আলো	পৃষ্ঠা: ০২
৩.	**জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন, সভাপতি অধ্যাপক ইউনূস**	দৈনিক প্রথম আলো	অনলাইন
৪.	**ছাত্রদের নতুন দল আসতে পারে ২৪ ফেব্রুয়ারি**	দৈনিক কাল বেলা	পৃষ্ঠা: ০১
৫.	**জাতিসংঘের কাঠগড়ায় শেখ হাসিনা**	দৈনিক যুগান্তর	পৃষ্ঠা: ০১
৬.	**সংস্কারের ফলাফল যেন অশ্বডিম্ব না হয়**	দৈনিক যুগান্তর	পৃষ্ঠা: ০৪
৭.	**গণভোটে সংবিধান সংশোধনের বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে হতে পারে: আলী রীয়াজ**	দৈনিক প্রথম আলো	অনলাইন

প্রথম আলো- ১৩-০২-২০০৫

মতামত

ন্যূনতম সংস্কার কর্মসূচির একটি নকশা

রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষক...

প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ০৮: ৩৬

অলিগার্কিক শাসনের পতন দেশের গভীর কাঠামোগত সংকটগুলো উন্মোচন করেছে। পতিত সরকার রেখে গেছে সর্বব্যাপী সংকট। জনগণের মধ্যে বাড়তে থাকা অসন্তোষ এখন বাস্তবতা। এ কারণেই দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

অপসারিত অলিগার্কিক শাসনব্যবস্থা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ ছিল। ব্যয় নির্বাহের সংকট মূলত শ্রমজীবী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে চলছে। ব্যাংকিং খাত নগদ অর্থের সংকটে হিমশিম খাচ্ছে। নীতিগত অনিশ্চয়তার কারণে উৎপাদন ও সেবা খাত হচ্ছে সংকুচিত। বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘমেয়াদি নীতি স্থায়িত্বের অভাবে মূলধন বিনিয়োগ করতে অনীহা প্রকাশ করছেন। ফলে অর্থনীতি সংকুচিত হয়ে মন্দার দিকে ধাবিত।

বিরাজমান এই সংকট শুধু অর্থনৈতিক নয়, এটি ভঙ্গুর এক রাজনৈতিক বন্দোবস্তের প্রতিচ্ছবি। রেখে যাওয়া ক্ষমতাকাঠামো ব্যর্থ হয়েছে টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায়। গণতান্ত্রিক কাঠামোর পরিবর্তে ত্রুটিপূর্ণ রাজনৈতিক বন্দোবস্ত তথা গোষ্ঠীস্বার্থকেই রাষ্ট্র পরিচালনার মূল ভিত্তি হিসেবে কায়েম করেছিল। অর্থনৈতিক নীতিকাঠামো সাধারণ জনগণের পরিবর্তে রাজনৈতিকভাবে সংযুক্ত একটি বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষায় ব্যবহৃত হয়েছে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের শিকার হয়ে নিয়ন্ত্রক সংস্থা, বিচারব্যবস্থা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো স্বায়ত্তশাসন হারিয়েছে। প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার অভাবে একধরনের দায়মুক্তির সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। পতিত শাসক জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়াই দেশ পরিচালনা করছিল।

নতুন রাজনৈতিক কাঠামো জরুরি

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই বৈপরীত্যগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। তবে কোনো সরকারই বৈধ রাজনৈতিক ম্যান্ডেট ছাড়া কার্যকর অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার আনতে পারবে না। বাংলাদেশকে এমন একটি শাসনকাঠামো গঠন করতে হবে, যা শুধু একটি সুবিধাভোগী শ্রেণির পরিবর্তে সাধারণ জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করবে।

সাম্য, গণতান্ত্রিক জবাবদিহি ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে একটি নতুন সামাজিক চুক্তি প্রয়োজন। তাহলেই জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধার হবে এবং তা দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে।

একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার, আস্থা তৈরি এবং প্রকৃত সংস্কার কার্যকর করতে পারে। নির্বাচিত সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা কেবল রাজনৈতিক নয়, এটি অর্থনৈতিকভাবেও অপরিহার্য। গণতান্ত্রিক বৈধতা ছাড়া যেকোনো দেশই স্থবিরতা, প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয় এবং ক্রমবর্ধমান জন-অসন্তোষের ঝুঁকির মধ্যে পড়ে।

সর্বসম্মত ন্যূনতম সংস্কার কর্মসূচি

অন্তর্বর্তী সরকার সংবিধান, নির্বাচন এবং বিচারব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে একাধিক কমিশন গঠন করেছে। এই সংস্কার পরিকল্পনা বিষয়ে দ্রুত সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো দরকার। ‘প্রথমে সংস্কার, পরে নির্বাচন’, এই নীতি সংকটকে আরও গভীর করবে। রাজনৈতিক দলের মধ্যে সর্বসম্মত ন্যূনতম সংস্কার কর্মসূচি এখন অপরিহার্য।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত কমিশনগুলো তাৎপর্যপূর্ণ সংস্কারের সুপারিশ করেছে। সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ আয়োজন করবে। মানুষের আশা সংলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো সমঝোতায় পৌঁছাবে। তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে ন্যূনতম সংস্কার কর্মসূচি সংলাপ আবর্তিত হতে পারে। ক. শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর; খ. অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন; গ. প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক শাসনকাঠামো।

এযাবৎ বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক দল স্বেচ্ছায় আরেকটি দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। এই প্রবণতা বদলাতে হবে। বিদ্যমান নির্বাচনী ব্যবস্থা জনগণকে সত্যিকারের বিকল্প বেছে নেওয়ার সুযোগ দেয়নি। জনগণ ভয় ও হুমকি থেকে মুক্ত থেকে তাদের মত প্রকাশ করতে পারে, এমন একটি নিরপেক্ষ ও নিরাপদ নির্বাচন সবার দাবি।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তন ছাড়া বাংলাদেশে প্রকৃত গণতন্ত্র ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বর্তমান সংকট দেখিয়েছে, শুধু শাসকের পরিবর্তনে সমস্যার সমাধান হয় না। কার্যকর রাজনৈতিক সংস্কৃতিই সুশাসন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জনগণের স্বার্থ নিশ্চিত করে। নতুন সরকার কিছু সময় পর আবার স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে না যায়, এর জন্য নির্বাহী বিভাগ তথা সরকারপ্রধানের ক্ষমতার আমূল সংস্কার জরুরি। একইভাবে রাষ্ট্রের তিন বিভাগ তথা সংসদ, নির্বাহী ও বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য আবশ্যিক। এদের গঠনগত কাঠামোয় পরিবর্তনও প্রয়োজনীয়।

এখন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। সেই জায়গায় স্থানীয় সরকারকেই কেন্দ্রে আনতে হবে। দলীয় রাজনীতির সংস্কার তথা রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র নিশ্চিত না হলে ক্ষমতার দখলদারি থামানো যাবে না। প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহির জন্য কঠোর নজরদারি ব্যবস্থার দরকার; অর্থাৎ সংলাপে প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক শাসনকাঠামো—কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার প্রত্যাবর্তন রোধ এবং জবাবদিহিমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি—বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটি চুক্তি হওয়া দরকার।

২০২৪ সালের জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থান স্পষ্ট করে জানান দিয়েছে যে রাষ্ট্রকে অবশ্যই গুটিকয় সুবিধাভোগীর পরিবর্তে অধিকাংশ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে। জনগণ স্পষ্টতই প্রতিষ্ঠানগুলোর অবমূল্যায়ন এবং ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

আগের সম্পদ-সংযোগনির্ভর সিন্ডিকেটগুলো রাষ্ট্রকে ধ্বংস করেছে। ধনী ও রাজনৈতিক অভিজাতদের মধ্যে আঁতাত প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করে দিয়েছে। নাগরিক ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে। ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা ও সুযোগসন্ধানী গোষ্ঠীতন্ত্রের দৌরাত্ম্য থাকলে দেশ কোনো বহিরাগত চাপ মোকাবিলা করতে পারে না।

নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর সামাজিক চুক্তি উপস্থাপন

অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনই স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার, আত্মবিশ্বাস তৈরি এবং প্রকৃত সংস্কার কার্যকর করার একমাত্র পথ। নির্বাচিত সরকারের প্রয়োজনীয়তা রাজনৈতিক পছন্দের বিষয় নয়, এটি আবশ্যক অর্থনৈতিক গতিশীলতার জন্য।

সংলাপে সমঝোতার মাধ্যমে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনের আগে জনগণের সামনে একটি নতুন সামাজিক চুক্তির স্পষ্ট বিস্তারিত রূপকল্প উপস্থাপন করাকে আবশ্যিক করতে হবে। ভোটাররা প্রস্তাবের বিভিন্ন অংশের বিচার-বিশ্লেষণ করে তাঁদের পছন্দসই দল ও প্রার্থী নির্বাচন করবেন। ইতিহাস সাক্ষী, প্রতিটি গণজাগরণই রাষ্ট্রের সংস্কারের নতুন যুগ সূচিত করে। অলিগার্কিক পৃষ্ঠপোষকতামূলক শাসন থেকে জনগণকেন্দ্রিক উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হতে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র, সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা এবং অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের বিকল্প নেই।

শক্তিশালী, স্বাধীন প্রতিষ্ঠান তৈরির মাধ্যমে পৃষ্ঠপোষকতামূলক নেটওয়ার্ক বিলোপ হতে পারে। গণতান্ত্রিক জবাবদিহিই নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নিশ্চিত করতে পারে। সংস্কার কমিশনগুলোর অনেক প্রস্তাবই রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নিজস্ব সামাজিক চুক্তিতে নিতে পারে। জনগণের সমর্থনপুষ্ট নির্বাচিত সরকারই বড় পরিসরে অধিকার, স্থিতিশীলতা এবং অগ্রগতির নিশ্চয়তাদানকারী সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের পথে

বাংলাদেশ এখন এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এসে হাজির হয়েছে। অর্থনৈতিক স্থবিরতা রাজনৈতিক সংকট থেকে বিচ্ছিন্নভাবে সমাধান করা যাবে না। গণতান্ত্রিক বৈধতা ছাড়া কোনো সরকারই অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা স্থাপন বা প্রয়োজনীয় সংস্কার আনতে পারে না। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন ছাড়া বাংলাদেশ কোনোভাবেই টেকসই উন্নয়নের পথে এগোতে পারবে না।

বাংলাদেশের জনগণের চাওয়া স্পষ্ট। আর তা হলো একটি গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহির নাগরিক রাষ্ট্র। আর তা বাস্তবে রূপ দিতে হলে কেবল রাজনৈতিক নেতাদের সদিচ্ছা যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, সামাজিক আন্দোলন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা তথা জনগণের মতামত ও তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করতে গণমাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ তুলে দিতে হবে। সুশাসনের জন্য সামাজিক আন্দোলনও জরুরি। জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে, যেন তারা কেবল দলীয় পরিচয়ে নয়; বরং সুশাসন ও ন্যায্যতা স্থাপনকারীর পক্ষে নির্বাচনে সিদ্ধান্ত দেন। এখনই সময়, পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়ার।

◦ **ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক

প্রথম আলো ১৩-০১-২০২৫

হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ আদেশ: অন্তর্বর্তী সরকার আইনি দলিল ও জনগণের ইচ্ছা দিয়ে সমর্থিত

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দেশ পরিচালনার জন্য অন্তর্বর্তী সরকার গঠন বিষয়ে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুয়ায়ী সুপ্রিম কোর্টের কাছে মতামত চান। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের পর অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা শপথ নেন।

অন্তর্বর্তী সরকার গঠন ও শপথ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের কাছে পাঠানো রেফারেন্স ও মতামতের প্রক্রিয়া নিয়ে রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের এক আইনজীবী। শুনানি নিয়ে বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি শিকদার মাহমুদুর রাজীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গত ১৩ জানুয়ারি রিটটি সরাসরি খারিজ করে আদেশ দেন। রিট খারিজ করে হাইকোর্টের দেওয়া পূর্ণাঙ্গ আদেশ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়।

হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ আদেশে বলা হয়, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার কোনো আইনি দলিল দিয়ে সমর্থিত নয় বলে রিট আবেদনকারীর (আইনজীবী মোহাম্মদ মহসিন রশিদ) বক্তব্যে এসেছে। উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এক ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উপদেশমূলক মতামত গ্রহণ করেন। মতামত অনুযায়ী কাজ করেছেন। তাই এটি আইনি দলিল দিয়ে সমর্থিত, বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছার দ্বারা সমর্থিত।

পূর্ণাঙ্গ আদেশে আরও বলা হয়, '২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে যে গণ-অভ্যুত্থান হয়েছিল, তা আমাদের ইতিহাসের অংশ এবং আশা করি আগামী বহু বছর ধরে জনগণ যত্নে থাকবে।'

রিটটি ভ্রান্ত ধারণা, বিদ্বেষপ্রসূত ও হয়রানিমূলক বলে উল্লেখ করে তা সরাসরি খারিজ করা হয়।

সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ারের বিষয়ে বলা আছে। অনুচ্ছেদটি বলছে, যদি কোনো সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হয়, আইনের এরূপ কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে বা উত্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, যা এমন ধরনের ও এমন জনগুরুত্বসম্পন্ন যে সেই সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহলে তিনি (রাষ্ট্রপতি) প্রশ্নটি আপিল বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করতে পারবেন। ওই বিভাগ স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত শুনানির পর প্রশ্নটি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করতে পারবেন।

সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মোহাম্মদ মহসিন রশিদ গত ডিসেম্বরে রিটটি করেছিলেন। রিট আবেদনকারীপক্ষের ভাষ্য, যে বিষয় (অন্তর্বর্তী সরকার বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা) সংবিধানে নেই, সে বিষয়ে রেফারেন্স চাওয়া যায় না। সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রেফারেন্সের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের রুলস অনুসরণ করতে হবে। আপিল বিভাগের রুল অনুসারে, অ্যাটর্নি জেনারেল ও অন্যদের নোটিশ দিয়ে শুনানি করতে হবে। শুনানির জন্য নোটিশ দেওয়া হয়নি।

অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষের ভাষ্য, রেফারেন্সের বিষয়ে অ্যাটর্নি জেনারেলকে নোটিশ করা হয়েছিল। তিনি শুনানিতে অংশ নিয়েছেন।

আদালতে রিটের পক্ষে আইনজীবী মোহাম্মদ মহসিন রশিদ নিজেই শুনানি করেন। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী এস এম মনিরুল আলম।

রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনীক আর হক ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আখতার হোসেন মো. আবদুল ওয়াহাব।

ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়। এরপর দেশ পরিচালনার জন্য অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। গত বছরের ৬ আগস্ট রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দেন। গত বছরের ৮ আগস্ট অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা শপথ নেন।

অন্তর্বর্তী সরকার গঠন ও শপথের আগে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন অন্তর্বর্তী সরকার গঠন বিষয়ে সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের কাছে মতামত চেয়ে রেফারেন্স পাঠান।

রাষ্ট্রপতির বিশেষ রেফারেন্সের (১/২৪) পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন সাত সদস্যের আপিল বিভাগ গত বছরের ৮ আগস্ট মতামত দেন। অ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তব্য শোনা হয়। মতামতে বলা হয়, রাষ্ট্রের সাংবিধানিক শূন্যতা পূরণে জরুরি প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের নির্বাহী কার্যপরিচালনার নিমিত্ত অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টা নিযুক্ত করতে পারবেন। রাষ্ট্রপতি ওইরূপ নিযুক্ত প্রধান উপদেষ্টা ও অন্য উপদেষ্টাদের শপথ পাঠ করাতে পারবেন।

প্রথম আলো ১৩-০২-২০২৫
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন, সভাপতি অধ্যাপক ইউনূস

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস *ফাইল ছবি: বাসস*

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে সভাপতি করে সাত সদস্যের জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করা হয়েছে। সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজকে এই কমিশনের সহসভাপতি করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ-সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

ঐকমত্য কমিশনের সদস্য হিসেবে রয়েছেন জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রধান আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী, পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রধান সফররাজ হোসেন, নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রধান বিচারপতি এমদাদুল হক এবং দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান ড. ইফতেখারুজ্জামান।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে এই কমিশন কাজ শুরু করবে। আগামী নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচনব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, সংবিধান ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিগুলোর সঙ্গে আলোচনা করবে এবং এই মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করবে এই কমিশন।

এ ছাড়া কমিশনের কার্যালয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে বলে জানানো হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, কমিশনের মেয়াদ হবে কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় এই কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা দেবে।

কালবেলা ১৩-০২-২০২৫

ছাত্রদের নতুন দল আসতে পারে ২৪ ফেব্রুয়ারি

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আগে ঘোষিত এক দফায় বলা হয়েছিল নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের কথা। সে ঘোষণা এবার রূপ পাচ্ছে বাস্তবে। সবকিছু ঠিক থাকলে অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রদের উদ্যোগে চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে আত্মপ্রকাশ ঘটছে বহুল আলোচিত এই নতুন দলের। দলের কাঠামো, গঠনতন্ত্র, নাম ও প্রতীক নির্ধারণ নিয়েই চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত হতে পারে সব সিদ্ধান্ত।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও নাগরিক কমিটির একাধিক নেতা জানিয়েছেন, ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে দল ঘোষণার বিষয়ে সবাই একমত হয়েছেন। দল ঘোষণার পর চলতি মাসের শেষ দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে দলীয় কর্মসূচিও পালন করতে চান তারা। সেক্ষেত্রে ২৫ ফেব্রুয়ারি দল ঘোষণার বিষয়ে মতামত আসে। ২৫ ফেব্রুয়ারি পিলখানা হত্যা দিবস হওয়ায় তার আগের দিন অর্থাৎ ২৪ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা হতে পারে বলে নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানিয়েছে।

নাগরিক কমিটির প্রথম সারির একাধিক নেতা জানান, তারা ফেব্রুয়ারির বাইরে যেতে চাচ্ছেন না। ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে, বিশেষ করে ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দল ঘোষণা করতে চান। ২৫ ফেব্রুয়ারি পিলখানা হত্যা দিবস হওয়ায় ২৪ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করা হতে পারে। সে অনুযায়ী তারা জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

নতুন দলের রাজনৈতিক কাঠামো কী হবে, তা নিয়েও আলোচনা চলছে জানিয়ে এই নেতারা বলেন, শুরুতে আহ্বায়ক কমিটি দিয়েই শুরু করতে চান তারা। আহ্বায়ক হিসেবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম অনেকটা চূড়ান্ত হলেও সদস্য সচিব নিয়ে চলছে আলোচনা। সেক্ষেত্রে এগিয়ে আছেন জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও সদস্য সচিব আখতার হোসেন। তাদের দুজন থেকে একজন সদস্য সচিবের দায়িত্ব নেবেন। এ ছাড়া নাগরিক কমিটির মুখপাত্র সামান্তা শারমিন, যুগ্ম আহ্বায়ক আলী আহসান জুনায়েদ, মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ, সদস্য সচিব আরিফ সোহেল ও মুখ্য সংগঠক আব্দুল হান্নান মাসুদ থাকছেন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে।

আরেকটি সূত্র জানিয়েছে, চমক হিসেবে কয়েকটি দলের তরুণ নেতাদের দেখা যেতে পারে এই দলে। কেউ কেউ দল ঘোষণার সময় আর কেউ বা নির্বাচনের আগে দলে যোগ দিতে পারেন। ইসলামী ছাত্রশিবির ও বাম ছাত্রনেতাদের কয়েকজনের যোগদানের বিষয়টি এরই মধ্যে চূড়ান্ত হয়েছে। উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম পদত্যাগ করলেও অন্য দুই তরুণ উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ও মাহফুজ আলমের এখনই পদত্যাগ করার সম্ভাবনা নেই। এ ছাড়া নাগরিক কমিটি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রথম সারির নেতারা রাজনৈতিক দলে যোগ দিলে এই দুই সংগঠনেও আসবে নতুন নেতৃত্ব। দ্বিতীয় সারির নেতারা অভ্যুত্থানের এই দুই শক্তির দায়িত্বে আসবেন বলে জানা গেছে।

নাগরিক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব বলেন, নাহিদ ইসলামকেই আহ্বায়ক

হিসেবে আমাদের নীতিনির্ধারণী ফোরাম চিন্তা করছে। তিনি উপদেষ্টা পদ থেকে পদত্যাগ করলে নতুন দলের দায়িত্ব নেবেন। নাগরিক কমিটি এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এভাবেই পরিকল্পনা করছে। অন্য দুই তরুণ উপদেষ্টাকে নিয়ে এখনো সে ধরনের কোনো ভাবনা নেই।

দলটির নাম এবং প্রতীকের বিষয়ে চলছে জনমত জরিপ। এ ক্ষেত্রে জনগণের চিন্তাকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন দলটির উদ্যোক্তারা। এরই মধ্যে শুধু অনলাইনেই প্রায় দেড় লাখ মানুষ নিজেদের মতামত জানিয়েছেন বলে জানা গেছে। নামের বিষয়ে নাগরিক কমিটির এক নেতা বলেন, বেশিরভাগ মানুষ নাগরিক, বৈষম্যবিরোধী, অধিকার এসব যুক্ত অর্থাৎ নাগরিক অধিকার পার্টি, নাগরিক মর্যাদা ইত্যাদি নাম সাজেস্ট করছেন। প্রতীক হিসেবে গতানুগতিক প্রতীকের বাইরে অর্থাৎ অভ্যুত্থানের কোনো চিহ্নকে বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন অনেকে।

নাগরিক কমিটির মুখ্য সংগঠক সামান্তা শারমিন কালবেলাকে বলেন, ‘দল গঠনের প্রক্রিয়া হিসেবে আমরা জনমত জরিপ করছি। অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইনেও বিভিন্ন জেলা থেকে মতামত আসছে। সে ডাটাগুলো অ্যানালাইসিস করা শুরু হবে। এরপরই আমরা বুঝতে পারব জনগণ কী ধরনের দল চাচ্ছে, কী ধরনের নাম চাচ্ছে, মার্কা চাচ্ছে। জনগণের মতামতকেই আমরা প্রাধান্য দেব। এ ছাড়া গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র আমরা প্রস্তুত করছি। আমরা ভাবছি যে, যাতে দলের মধ্যে নতুন নেতৃত্ব তৈরি হয়। এক ব্যক্তি কিংবা পরিবারকেন্দ্রিক কালচার যেন তৈরি না হয়।’

এদিকে নতুন দলের কাঠামো, গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র চূড়ান্ত করতে কাজ করছেন নাগরিক কমিটি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা। দেশের সব রাজনৈতিক দল এবং বহির্বিশ্বের যেসব দল অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে, সেসব দলকে নিয়ে বিস্তর গবেষণা করছেন তারা। এর মধ্যে ভারতের অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম-আদমি পার্টি, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের দল জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (একে) পার্টি এবং পাকিস্তানের দল ইমরান খানের তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) রয়েছে।

সামান্তা শারমিন বলেন, ‘দেশে এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন দলের গঠন প্রক্রিয়া আমরা বিশ্লেষণ করছি। বিশেষ করে অভ্যুত্থান এবং যুদ্ধের পরে যে ধরনের পার্টি গঠিত হয়েছে, সেসব আমরা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করছি। আমাদের এমন একটা স্ট্রাকচার দরকার, যেটি একই সঙ্গে জনগণের কাছে অপরিচিত নয়, আবার অভ্যুত্থানের যে স্পিরিট সেটাকে ধারণ করবে। জনগণকে একটা সুন্দর রাজনৈতিক দল উপহার দেওয়ার জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মানুষের বিপুল রেসপন্স আমরা পাচ্ছি। গুগল ফর্ম ছাড়ার দুই ঘণ্টার মধ্যেই প্রায় লক্ষাধিক মানুষ মতামত প্রধান করেছে।

নতুন দলের বিষয়ে সহ-মুখপাত্র সালেহ উদ্দিন সিফাত কালবেলাকে বলেন, ‘নতুন রাজনৈতিক দল জুলাই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট নতুন রাষ্ট্রকল্প ও প্রস্তাবনা নিয়ে আসছে। স্বাস্থ্য খাত থেকে শুরু করে শিক্ষা খাত, পররাষ্ট্রনীতি, অর্থ খাত, পরিবেশবিষয়ক নানা প্রস্তাবনা আমরা এরই মধ্যে নাগরিকদের কাছ থেকে পাচ্ছি। এগুলো সন্নিবদ্ধ করার কাজ চলমান। নাগরিকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছাত্র-তরুণদের এই দল গঠনে নিজেদের শামিল করছেন।

আমাদের প্রবাসী রেমিট্যান্স যোদ্ধারাও প্রবাসীদের ভোটাধিকার বাস্তবায়নসহ নানা গঠনমূলক প্রস্তাবনা দিচ্ছেন। এর মাধ্যমে জনগণের মধ্য থেকে রাজনৈতিক দল গঠনের অভূতপূর্ব নজির বাংলাদেশে স্থাপিত হতে যাচ্ছে।'

এদিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি অরাজনৈতিক সংগঠন হিসেবেই থাকবে বলে জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তিনি জানান, রাজনৈতিক দলটি নতুন নামে আত্মপ্রকাশ করবে। চাইলে ওই দুটি ফোরাম থেকে যে কেউ নতুন দলে যোগ দিতে পারবেন।

নাসীরুদ্দীন বলেন, 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি প্রেসার গ্রুপ হিসেবে কাজ করবে। এই দুই অংশের কেউ চাইলে নতুন রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে পারবেন। আমাদের সঙ্গে বিপ্লবী, সিভিল সোসাইটি ও পলিটিক্যাল—তিন ধরনের লোক আছেন, যারা রাজনীতি করতে চান। নতুন রাজনৈতিক দল যদি তাদের পছন্দ হয় সেখানে তারা অবশ্যই যোগ দিতে পারবেন।'

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক আব্দুল হান্নান মাসুদ কালবেলাকে বলেন, 'ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে যাতে আমরা নতুন দল ঘোষণা করতে পারি, তা নিয়ে জোর প্রস্তুতি চলছে। এর মধ্যে গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র তৈরিসহ অন্যান্য কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। শিগগিরই দলের নাম ও প্রতীক চূড়ান্ত হবে। গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া নেতারাই থাকবেন এই দলের নেতৃত্বে। চমকও থাকতে পারে। সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে নিয়ে আমরা বাংলাদেশপন্থি একটা রাজনৈতিক দল গঠনের চেষ্টা করছি।'

যুগান্তর ১৩-০২-২০২৫

জাতিসংঘের কাঠগড়ায় শেখ হাসিনা

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশেই জুলাই-আগস্টে সংঘটিত হয় বাংলাদেশের ইতিহাসে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড। নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয় ১৪০০ নিরস্ত্র মানুষকে। এর মধ্যে সাধারণ শিক্ষার্থী, নিরস্ত্র বিক্ষোভকীরা, নারী ও শিশু রয়েছে। হত্যাকাণ্ডের শিকার মোট শিশু ১১৮। শতকরা হিসাবে যা ১২-১৩ শতাংশ। আহত হয়েছেন প্রায় ১২ হাজার।

৬৬ শতাংশই মিলিটারি রাইফেলের গুলিতে এবং ১২ শতাংশ শটগানের গুলিতে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। প্রমাণ হয়েছে-ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে এই নৃশংসতার পথ বেছে নিয়ে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার নির্দেশ দেন হাসিনা। পুরো বিষয়টি সমন্বয় করেন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল।

সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি হত্যাকাণ্ডে অংশ নেন আওয়ামী লীগের সংসদ-সদস্যরাও। এটি ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার, গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং আন্তর্জাতিক ফৌজদারি অপরাধ।

আন্দোলনকারীদের অনেকে প্রাথমিক পর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার। জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের (ওএইচসিএইচআর) ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং রিপোর্টে এসব উঠে এসেছে।

বুধবার প্রতিষ্ঠানটির জেনেভা কার্যালয় থেকে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। পরে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক।

এ সময় তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণের বিরোধিতার মুখেও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকার। এ উদ্দেশ্য হাসিলে তারা বিক্ষোভ দমনের কৌশল নিয়েছিল। এটা করতে গিয়েই নির্বিচারে হত্যা, গ্রেফতার, আটক ও নির্যাতন চালিয়েছে আন্দোলনকারীদের ওপর।

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর 'ওএইচসিএইচআর'কে হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি তদন্তের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। আমন্ত্রণে সারা দিয়ে ১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট সংঘটিত ঘটনা তদন্তে স্বাধীন ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন পরিচালনা করে জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনার। তাদের প্রতিবেদনে অভিযুক্তদের আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি তুলে ধরা হয়। বলা হয়, এসব ঘটনায় নির্বিচারে হত্যার প্রমাণ মিলেছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, কমিশন বিশ্বাসযোগ্যভাবে মনে করছে-সামরিক, আধাসামরিক এবং গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা হত্যাকাণ্ডে জড়িত। তারা হতাহতদের হাসপাতালে চিকিৎসায় বাধা দিয়েছে। ভয় দেখিয়েছে চিকিৎসকদের।

গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের কাজ রাজনৈতিক নেতৃত্বের পূর্ণ স্বজ্ঞানে, সমন্বয় এবং নির্দেশনায় হয়েছে। শেখ হাসিনার পাশাপাশি তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা শাখার নেতৃত্ব ও সমন্বয়ে এসব ঘটে। সরকারি ঊর্ধ্বতন কর্তকর্তাদের সাক্ষ্য অনুসারে প্রধানমন্ত্রী তাদের অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগের নির্দেশ দিতেন, নিয়মিত নজরদারি করতেন এবং রিপোর্ট পেতেন। পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব, ডিজিএফআই এবং গোয়েন্দা শাখা দ্বারা পরিচালিত অপারেশনের জন্য সরাসরি আদেশ জারি করা হয়।

এসব বাহিনী প্রতিবাদকারী ও সাধারণ নাগরিকদের নির্বিচারে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা এবং আটকের মতো গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।

সরকারি ও বেসরকারি সূত্রের তথ্য বিশ্লেষণ করে ওএইচসিএইচআর মনে করছে, আন্দোলন চলাকালে ১৪০০ মানুষ নিহত হতে পারে। যাদের বেশির ভাগই বাংলাদেশের নিরাপত্তাবাহিনীর ব্যবহৃত প্রাণঘাতী অস্ত্র, সামরিক রাইফেল এবং শটগানের গুলিতে মারা যায়। হাজার হাজার আহত ব্যক্তি তাদের জীবন বদলে দেওয়ার মতো গুরুতর আঘাতের শিকার হয়েছেন। পুলিশ ও র‍্যাব তথ্য দিয়েছে, তারা ১১ হাজার ৭০০'র বেশি মানুষকে গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীও শিশুদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। এ সময় যারা নিহত হয়েছে, তাদের ১২-১৩ শতাংশই শিশু। শিশু হত্যা, উদ্দেশ্যমূলকভাবে পঙ্গু করা, নির্বিচারে গ্রেফতার এবং অমানবিক নির্যাতন চরম অপরাধ।

মানবাধিকার কমিশন মনে করে, বিক্ষোভ এবং ভিন্নমত দমনের কৌশল হিসাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। গুরুতর এসব মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা আন্তর্জাতিক ফৌজদারি অপরাধ আইনের দৃষ্টিকোণ থেকেও উদ্বেগজনক। কোন মাত্রার মানবতাবিরোধী অপরাধ হয়েছে, তা মূল্যায়নে দেশীয় আইনে ফৌজদারি তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে।

প্রেক্ষাপট: সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধাদের পরবর্তী প্রজন্মের ৩০ শতাংশ কোটা পুনর্বহাল রেখে ৫ জুন রায় দেন উচ্চ আদালত। এই রায়ের বিরুদ্ধে ঢাকায় তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এর সঙ্গে যোগ হয় বিগত সময়ে মানুষের নানা ধরনের ক্ষোভ। এ ক্ষোভের মূলে ছিল রাজনৈতিক ব্যর্থতা, রাষ্ট্রপরিচালনায় অদক্ষতা, শাসনব্যবস্থার ভঙ্গুরতা ও দুর্নীতি।

অর্থনৈতিক বৈষম্য সমস্যা আরও জটিল করে তুলেছিল। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে সমান সুযোগের অভাব জনগণের ক্ষোভকে আরও উসকে দিয়েছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক, পেশাগত এবং ধর্মীয় পটভ,মি থেকে আসা হাজার হাজার নারী, পুরুষ ও শিশু বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিল। ছাত্র-জনতা অর্থপূর্ণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের দাবি জানিয়েছিল।

জনগণের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ দমন এবং ক্ষমতা আঁকড়ে ধরার প্রচেষ্টায় সাবেক সরকার সহিংসতাকে অবলম্বন হিসাবে বেছে নেয়। শক্তি প্রয়োগ করে বিক্ষোভ দমনের চেষ্টা করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত হয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। বেশ কয়েকজন সমন্বয়ক তৈরি হয়।

সশস্ত্র হামলা করে আন্দোলন দমনের চেষ্টা: প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে সাবেক সরকার এবং আওয়ামী লীগের সশস্ত্র কুশীলবরা সুসংহত হতে থাকে। বিক্ষোভ

দমনের প্রাথমিক চেষ্টা হিসাবে সরকারের মন্ত্রীসহ আওয়ামী লীগ নেতারা ছাত্রলীগকে উৎসাহিত করেন।

এতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং এর আশপাশে ছাত্রছাত্রীদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশের ওপর ছাত্রলীগ লাঠি, ধারালো অস্ত্র এমনকি আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে। শিক্ষার্থীরা এ সময় কখনো কখনো আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। সরকার এরপর আরও গুরুতর সহিংসতার পথ বেছে নেয়।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন করে পুলিশ, আওয়ামী লীগ সমর্থকদের একটি অংশ সশস্ত্র অবস্থায় সমন্বিতভাবে শক্তি প্রয়োগ করে। এভাবেই তারা শান্তিপূর্ণ ছাত্র বিক্ষোভ দমনের চেষ্টা করে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১৭ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত একটি বড় বিক্ষোভ।

যেভাবে ছড়িয়ে পড়ে আন্দোলন: এসব ঘটনার পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা সাধারণ বিক্ষোভ এবং ঢাকা ও অন্যান্য শহরে সম্পূর্ণ বন্ধের ডাক দেয়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং জামায়াতে ইসলামী এতে সমর্থন করে।

এর প্রতিক্রিয়ায় তৎকালীন সরকার বিক্ষোভকারী এবং প্রতিবাদী সংগঠকদের বিরুদ্ধে আরও সহিংস হয়ে ওঠে। এতে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ, স্বাধীনতা এবং ব্যক্তির নিরাপত্তা লাভের অধিকার লঙ্ঘিত হয়। র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এবং পুলিশের হেলিকপ্টার আকাশ থেকে বিক্ষোভকারীদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করে। পুলিশ, র‍্যাব এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মাঠে সামরিক রাইফেল এবং লোড করা শটগানের প্রাণঘাতী ছররা গুলি ছুড়ে। সেই সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কম প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করে।

বিক্ষোভকারীদের মধ্যে কেউ কেউ রাস্তা বন্ধ এবং কিছু স্থাপনা ভাঙচুরের চেষ্টা করে। কিন্তু তখন পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ চলে আসছিল। এ ধরনের হামলার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য কিছু বিক্ষোভকারী পালাক্রমে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও লাঠিসোঁটা ব্যবহার করে।

এ ক্রমাবনতিশীল পরিস্থিতি এবং রাষ্ট্রীয় সহিংসতার প্রতিক্রিয়ায় বিক্ষোভকারীদের কিছু অংশ সহিংস কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। যাদের বেশির ভাগ সরকারি ভবন, পরিবহণ অবকাঠামো এবং পুলিশকে লক্ষ্য করে আক্রমণ করে। ১৮ জুলাই সন্ধ্যায় সরকার বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী বল প্রয়োগের জন্য নিরাপত্তা বাহিনী জোরদার করার নির্দেশ দেয়। ১৯ জুলাই থেকে বিক্ষোভ শেষ হওয়া পর্যন্ত বিজিবি, র‍্যাব ও পুলিশ ঢাকা এবং অন্যত্র বিক্ষোভকারীদের ওপর নির্বিচারে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করে। এ কারণে প্রতিবাদ কাভার করতে আসা সাংবাদিকসহ অনেকে বিচারবহিভর্‚ত হত্যাকাণ্ডের শিকার এবং আহত হন।

২০ ও ২১ জুলাই ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধের সময় পুলিশ এবং র‍্যাব গুলি ছোড়ার পূর্ণ ছাড়পত্র পায়। এতে নিহত ও আহতের ঘটনা ঘটে। জুলাইয়ের শেষদিকে সেনাবাহিনীও ব্যাপক অভিযানে অংশ নেয়। ওই সময়ে পুলিশ ও র‍্যাব গণবিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে নির্বিচারে বিপুলসংখ্যক মানুষকে গ্রেফতার করে। কিছু ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বাহিনী উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের ওপর খুব কাছ থেকে গুলি ছোড়ে।

পুলিশ এবং আধা-সামরিক বাহিনী বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে সহিংস পথ অবলম্বন করেও তাদের দমাতে পারেনি। উলটো ক্ষোভ আরও বেড়ে যায়। ২০ জুলাই, সরকার সাধারণ কারফিউ জারি করে এবং সেনাবাহিনী মোতায়েন করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সৈন্যরা বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে ফাঁকা গুলি ছোড়ে, যা বিক্ষোভকারীদের নিহত বা গুরুতর আহত হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি করেনি। কেবল একজন বিচারবহিভর্‌,ত হত্যাকাণ্ডের শিকার হন।

সেনাপ্রধানের বৈঠক: প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, আন্দোলন পরিস্থিতি নিয়ে ৩ আগস্ট সেনা অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করেন সেনাবাহিনীর প্রধান। বৈঠকে বেসামরিক বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের নির্দেশ প্রত্যাখ্যানের জন্য চাপ দেন জুনিয়র অফিসাররা। তারা বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকৃতি জানান।

এরপরও সেনাবাহিনী আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের প্রতিরক্ষা সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে আরও সহিংস হতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তারা পালটা আক্রমণের আশঙ্কা ছাড়াই বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী বল প্রয়োগের অনুমতি পায়।

সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, ৫ আগস্ট বিক্ষোভকারীরা যে ঢাকা মার্চের ডাক দেয়, তা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে থামানোর জন্য সেনাবাহিনী, বিজিবি ও পুলিশকে একটি সরকারি পরিকল্পনা তৈরি করতে বলা হয়েছিল। সেই পরিকল্পনা অনুসারে পুলিশ অনেক বিক্ষোভকারীকে গুলি করে হত্যা করে; কিন্তু সেনাবাহিনী ও বিজিবি বৃহৎ অর্থে নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। ফলে বিক্ষোভকারীরা নির্বিঘ্নে তাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতা ও মানবাধিবার লঙ্ঘন: এ আন্দোলন দমনের নামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিল গোয়েন্দা সংস্থা। এর মধ্যে রয়েছে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থা ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স (ডিজিএফআই), ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স (এনএসআই), ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি), পুলিশের বিশেষ গোয়েন্দা শাখা ডিবি, অন্যান্য বাহিনীর বিশেষ শাখা এবং কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসিইউ)।

তারা গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘন করে নজরদারির মাধ্যমে পাওয়া তথ্য এক সংস্থা থেকে আরেক সংস্থার সঙ্গে শেয়ার করে। এর মাধ্যমে জুলাইয়ের শেষের দিকে ব্যাপক হারে নির্বিচারে গ্রেফতারের পক্ষে প্রচারণা চালায়। গোয়েন্দা শাখা বন্দিদের কাছ থেকে তথ্য ও স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য নিয়মিত ও নির্বিচারে আটক ও নির্যাতনের আশ্রয় নেয়। সিটিটিসির সদর দপ্তর শিশুসহ নির্বিচারে আটক ব্যক্তিদের বন্দিস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। গোয়েন্দা শাখা এবং ডিজিএফআই যৌথভাবে ছাত্রনেতাদের সেখানে অপহরণ ও আটক করে এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমে বিক্ষোভকারীদের আন্দোলন থেকে সরে আসতে চাপ দেয়।

ডিজিএফআই, এনএসআই এবং গোয়েন্দা শাখার লোকজন আহতদের জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা সেবায় বাধাগ্রস্ত করে, প্রায়ই হাসপাতালে রোগীদের জিজ্ঞাসাবাদ, আহত ব্যক্তিদের গ্রেফতার এবং চিকিৎসাকর্মীদের ভয়ভীতি দেখাতে থাকে। এ পরিস্থিতি আইন সহায়তাকারী কর্তৃপক্ষ বা বিচার বিভাগ কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি যাতে নির্বিচারে আটক ও নির্যাতনের ঘটনা এবং অনুশীলনগুলো বন্ধ করা যায়। এ ধরনের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো কর্মকর্তার জবাবদিহি

নিশ্চিত করা হয়নি। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও গুরুতর মানবধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা চেপে রাখার পক্ষে কাজ করে।

এনটিএমসি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনের সঙ্গে কাজ করে। এতে বিক্ষোভকারীরা কর্মসূচি সংগঠিত করতে ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবহারের সুযোগ হারায়। সহিংসতা সম্পর্কিত তথ্য ইন্টারনেট বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আদান-প্রদানে জনগণের অধিকার সংকুচিত করা হয়।

একই সঙ্গে ডিজিএফআই, এনএসআই এবং র‍্যাব গণবিক্ষোভ এবং তাদের সহিংসতা দমন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্ট না করার জন্য মিডিয়ার ওপর চাপ দেয়। ডিজিএফআই পুলিশের সঙ্গে যোগ দিয়ে ভিকটিম, তাদের পরিবার এবং আইনজীবীদের নীরব হওয়ার ব্যাপারে ভয় দেখাতে থাকে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ওএইচসিএইচআর এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাচ্ছে যে পুলিশ, আধা-সামরিক, সামরিক এবং গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িতরা নিয়মিতভাবেই মানবাধিকার লঙ্ঘন করে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের পূর্ণজ্ঞান, সমন্বয় এবং নির্দেশনার ভিত্তিতে এ সহিংসতা ঘটানো হয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা শাখার তৎপরতাগুলো সমন্বয় করতেন এবং নেতৃত্ব দিতেন।

উভয় পক্ষ একাধিক সূত্র থেকে বাস্তবে কী ঘটছে, সেই পরিস্থিতি সম্পর্কে নিয়মিত প্রতিবেদন পেতেন। ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাদের সাক্ষ্য অনুসারে, ২১ জুলাই এবং আগস্টের শুরুতে প্রধানমন্ত্রীকে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রতিবেদন সরবরাহ করতেন।

রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিজিবি, র‍্যাব, ডিজিএফআই, পুলিশ এবং গোয়েন্দা শাখার দ্বারা পরিচালিত কার্যক্রমের অনুমোদন ও নির্দেশ জারি করে। এসব বাহিনী প্রতিবাদকারী ও সাধারণ নাগরিকদের নির্বিচারে বিচারবহিভর্‚ত হত্যা এবং আটকের মতো গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।

নিরাপত্তা বাহিনী ও আওয়ামী লীগের র্কমীদের মাধ্যমে যৌন হয়রানি: বিক্ষোভের সময় অগ্রভাগে থাকার কারণে মেয়েরাও নিরাপত্তা বাহিনী এবং আওয়ামী লীগ সমর্থকদের দ্বারা হামলার শিকার হন। তারা বিশেষভাবে যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার হয়। যার মধ্যে রয়েছে লিঙ্গভিত্তিক শারীরিক সহিংসতা, ধর্ষণের হুমকি এবং কিছু নথিভুক্ত ঘটনার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের দ্বারা সংঘটিত যৌন নির্যাতন। ওএইচসিএইচআর প্রতিশোধমূলক ঘটনা হিসাবে যৌন সহিংসতা এবং ধর্ষণের হুমকি সম্পর্কিত অভিযোগ পেয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের তৎপরতা: আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং অপব্যবহারের জন্য জবাবদিহি নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। এ পদক্ষেপগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আইসিটি) পাশাপাশি নিয়মিত আদালতে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

যদিও অন্তর্বর্তী সরকার স্বতন্ত্র ধর্মীয় ও আদিবাসী গোষ্ঠীর ওপর হামলার ঘটনায় ১০০ জনকে গ্রেফতার করেছে বলে জানিয়েছে। প্রতিশোধমূলক সহিংসতাসহ অন্যান্য অনেক অপরাধের সঙ্গে জড়িতরা এখনো দায়মুক্তি ভোগ করছে।

হত্যাকাণ্ডের ৬৬ শতাংশ মিলিটারি রাইফেলের গুলিতে : আন্দোলনে নিহতদের ৭৮ শতাংশই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে। এর মধ্যে আবার ৬৬ শতাংশ মিলিটারি রাইফেলের গুলিতে, ১২ শতাংশ শটগানে। আবার শটগানের ক্ষেত্রে ৮ শতাংশ মেটাল শটগান।

২ শতাংশ নিহিত পিস্তলের গুলিতে এবং ২০ শতাংশ অন্যান্যভাবে। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, পুলিশ ও আনসার ভিডিপি বাহিনী শটগান ব্যবহার করে। আবার নিহত অনেকের শরীরে পাওয়া বুলেটের আঘাতের ধরন থেকে বোঝা যায়, তারা ৭.৬২৩৯ এমএম মাপের সামরিক মানের প্রাণঘাতী গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন।

এই অস্ত্র বাংলাদেশ অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি তৈরি করে। অন্যদিকে ৭.৬২ এমএম মিমি ক্যালিবারের গুলি ব্যবহারের প্রমাণ মিলেছে। এগুলো সামরিক বাহিনীর জন্য তৈরি করা হয়। যা সেনাবাহিনী, বিজিবি ও র‍্যাব ব্যবহার করে।

হাসপাতাল থেকে মরদেহ লুকানো : কিছু ক্ষেত্রে পুলিশ হত্যাকাণ্ড গোপন করার জন্য হাসপাতাল থেকে মরদেহ নিয়ে লুকিয়ে রাখে। এর মধ্যে কিছু পুড়িয়ে ফেলা হয়। কিছু ক্ষেত্রে মরদেহের গুলির চিহ্ন সরিয়ে কোনো রেকর্ড ছাড়াই পুলিশের কাছে সরবরাহ করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

যেভাবে রিপোর্ট তৈরি করা হয় : এই প্রতিবেদন তৈরিতে ২৩০ জন বাংলাদেশির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এর মধ্যে সরকার, নিরাপত্তা বিভাগ এবং রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তাদের আরও ৩৬টি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ঘটনাসংশ্লিষ্ট সরেজমিন অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন অনেক সাবেক এবং বর্তমান সিনিয়র কর্মকর্তারা রয়েছেন।

তথ্য-উপাত্তগুলোর সত্যতা ভিডিও এবং ফটো, মেডিকেল ফরেনসিক বিশ্লেষণ, অস্ত্র বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য তথ্যবিশ্লেষণ সাপেক্ষে তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

যুগান্তর ১৩-০২-২০২৫

সংস্কারের ফলাফল যেন অশ্বডিম্ব না হয়

মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া

এক কথায় বলতে গেলে, রাষ্ট্র ও সমাজের কল্যাণমুখী উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিক, নীতিগত, পদ্ধতিগত ও আইনি পরিবর্তনের দ্বারা বিদ্যমান অব্যবস্থার ইতিবাচক আমূল পরিবর্তনই সংস্কার। রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার হতে পারে। যেমন-জনপ্রশাসন, রাজনীতি, শিক্ষা, অর্থনীতি ও আইন। রাষ্ট্র ও সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক অসংগতি, অস্বচ্ছতা, অদক্ষতা ও অন্যায্যতা দেখা দিলে সংস্কার অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে এমনই একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার কারণেই অন্তর্বর্তী সরকার অনেক ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে এবং এ লক্ষ্যে কয়েকটি সংস্কার কমিশনও গঠন করেছে। জনগণ আশা করেছিল, সংস্কার কমিশনগুলো প্রতিটি ক্ষেত্রের মূল সমস্যাগুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করে রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বাস্তবায়ন সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলো দাখিল করবে। কিন্তু কয়েকটি কমিশনের প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, তাদের অধিকাংশ সুপারিশই রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সক্ষমতার বাইরে। সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নের সঙ্গে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়াও দক্ষ ও সুসংগঠিত জনপ্রশাসনের প্রয়োজন হয়, যা বর্তমানে অনুপস্থিত। স্বপ্নে পাহাড়ে চড়া যতটা সহজ, বাস্তবে ততটাই কঠিন। মনে রাখতে হবে, মই দিয়ে পাহাড়ে চড়া যায় না।

সংস্কার কমিশনগুলোর মধ্যে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। এ কমিশনের প্রতিবেদন সবচেয়ে হতাশাব্যঞ্জক। প্রতিবেদনটি অনেকটা দায়সারা গোছের। বেশ কয়েকটি সুপারিশে অসংগতি ও অস্পষ্টতা রয়েছে, রয়েছে বাস্তবায়ন অযোগ্যতাও। উদাহরণ হিসাবে দু-একটি বিষয় তুলে ধরা হলো।

প্রতিবেদনের ৭ অনুচ্ছেদে অনেক অসংগতি রয়েছে। ৭. ১৩ ‘ক’ অনুচ্ছেদে সব সার্ভিসের মধ্য থেকে সচিবালয়ের উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত পদগুলো নিয়ে ‘সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস’ (এসইএস) গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। ‘খ’ উপ-অনুচ্ছেদে উপসচিবের ৫০ শতাংশ পদ প্রশাসনিক সার্ভিসের জন্য সংরক্ষণের সুপারিশ করা হয়েছে। তাহলে উপসচিব পদের ৫০ শতাংশ কি প্রশাসনিক সার্ভিসের এবং ৫০ শতাংশ এসইএস সার্ভিসের হবে? অন্য সার্ভিস থেকে আসা উপসচিবদের মধ্যে যারা যুগ্মসচিবের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবেন, তারা উপসচিব হিসাবেই ১৫-২৫ বছর চাকরি করবেন। এভাবে অকৃতকার্যের সংখ্যা বেড়ে ৫০ শতাংশ পদই একসময় পূর্ণ হয়ে যেতে পারে। উল্লেখিত অনুচ্ছেদে প্রশাসনিক সার্ভিস ও এসইএসের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলা হয়েছে।

প্রশাসন সার্ভিসের লাইন পদ হিসাবে অতিরিক্ত জেলা কমিশনার থেকে বিভাগীয় কমিশনার পদগুলোর উল্লেখ করা হলেও এ লাইন পদে এসইএস সার্ভিসের সদস্যদের পদায়নের সুযোগ রাখা হয়েছে। যদি তাই হয়, তাহলে এসব পদ প্রশাসন সার্ভিসের লাইন পদ হয় কীভাবে? এছাড়া প্রশাসন সার্ভিস থেকে পদোন্নতি পাওয়া জেলা প্রশাসকের মর্যাদার মানের চেয়ে এসইএস

সার্ভিসের সদস্যের মধ্য থেকে পদায়িত জেলা প্রশাসকদের মান অধিক হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে কি দুই ধরনের মর্যাদা-মানসম্পন্ন জেলা প্রশাসক থাকবেন? এটা কি আজব প্রস্তাব মনে হয় না!

ভারতে 'জেলা শাসক' ও 'মহকুমা শাসক' পদবি এখনো বিদ্যমান। আমাদের দেশের পদবি হচ্ছে 'জেলা প্রশাসক', 'জেলা শাসক' নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'জেলা প্রশাসক' পদবিটি পছন্দ না হলে পরিবর্তন করা যেতেই পারে। কিন্তু পদবি পরিবর্তনের দ্বারা কি চিন্তা ও মনমানসিকতার পরিবর্তন হবে? এ পদে পদায়িতদের চিন্তা ও মনমানসিকতার পরিবর্তনের কোনো সুপারিশ কি করা হয়েছে? এসব পদবি পরিবর্তনের ফলে পৌর কমিশনার, জেলা কমিশনার ও উপজেলা কমিশনারের পার্থক্য বুঝতে জনগণের হয়তো একটু সময় লাগবে। চমক সৃষ্টি বা কোনো গোষ্ঠীকে খুশি করার জন্য কোনো সুপারিশ সংস্কার কমিশনের কাছ থেকে কাম্য নয়। বর্তমান প্রশাসন এবং মাঠ প্রশাসন অনেকটা দুর্বল অবস্থায় আছে। একে আরও দুর্বল করার পরিণতি কী হতে পারে, আইনশৃঙ্খলাসহ নির্বাচনব্যবস্থায় কী প্রভাব পড়তে পারে, সে বাস্তবতা উপলব্ধি করতে হবে।

সুপারিশের ভাষাদৃষ্টে মনে হয়, সব সার্ভিসের পদে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে পদোন্নতির সুপারিশ করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষা দ্বারা মেধা যাচাই করা যায়। সংশ্লিষ্ট পদের যোগ্যতা ও দক্ষতা যাচাই করা যায় না। লাখ লাখ উচ্চশিক্ষিতের মধ্য থেকে এক শতাংশেরও কমসংখ্যক ক্যাডারে নিয়োগ পায়। এরা যদি মেধাবী না হয়, তাহলে মেধাবী কারা? এরপর তাদের বিভাগীয় পরীক্ষায়, সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। এরপরও কি মেধা যাচাইয়ের প্রয়োজন হয়? এরপর উচ্চতর পদগুলোতে পদায়নের জন্য প্রয়োজন হয় সংশ্লিষ্ট পদে কাজ করার যোগ্যতা ও দক্ষতা যাচাইয়ের, যা লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। এছাড়া সমগ্র চাকরিজীবনে যদি পদোন্নতি পরীক্ষার পেছনেই ছুটতে হয়, বিভিন্ন গাইডবই পড়ে সময় কাটাতে হয়, তাহলে জনগণকে সেবা দেবে কখন? এছাড়া এভাবে এতসংখ্যক পরীক্ষা নেওয়ার সক্ষমতা অর্জনের জন্য কত বছর সময় প্রয়োজন, সেটা কি বিবেচনা করা হয়েছে?

এছাড়া বিদ্যমান জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল ক্যাডারের সঙ্গে নন-ক্যাডার এলজিইডি সার্ভিস, বিসিএস (বন) ক্যাডারের সঙ্গে নন-ক্যাডার পরিবেশ সার্ভিস, তথ্য ক্যাডারের সঙ্গে নন-ক্যাডার আইসিটির কর্মকর্তাদের সংযুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে, পরিসংখ্যান ক্যাডারকে নন-ক্যাডারে রূপান্তরের সুপারিশ করা হয়েছে। এ ক্যাডার-ননক্যাডার একত্র করার সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা পর্যালোচনা করা হয়েছে বলে মনে হয় না।

প্রাদেশিক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এছাড়া এ সুপারিশের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক অবস্থা এবং বাস্তবায়নযোগ্যতা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না।

অধিকাংশ সুপারিশেরই বাস্তবায়নকাল মধ্যমেয়াদি উল্লেখ করা হয়েছে। সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ ও সুসংগঠিত জনপ্রশাসন প্রয়োজন হয়। বর্তমান জনপ্রশাসন ভঙ্গুর ও অগোছালো। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক, সাংগঠনিক ও আইনি সংস্কার করার মতো যথেষ্ট দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে পেনশন, চাকরিতে প্রবেশের বয়স ও

সম্পত্তির হিসাব দাখিলের যে তিনটি বিধান জারি করা হয়েছে, তিনটিই অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ। সুতরাং, ব্যক্তিগত পছন্দ ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের দ্বারা সাজানো এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতির ছায়াতলে গড়ে ওঠা জনপ্রশাসন দ্বারা ১-২ বছর সময়সীমার মধ্যে অধিকাংশ সংস্কার প্রস্তাবই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

সপ্তম অধ্যায়ের 'ঙ' অনুচ্ছেদে উপসচিবের পদের ৫০ শতাংশ প্রশাসন সার্ভিসের জন্য সংরক্ষিত রাখার কথা উল্লেখ করা হলেও ওই অনুচ্ছেদেই উপসচিবের সব পদ সবার জন্য উন্মুক্ত রাখার উল্লেখ রয়েছে, যা পরস্পরবিরোধী। ৭.১৮ অনুচ্ছেদে বেতন স্কেলের সর্বোচ্চ ধাপকে পদোন্নতির সর্বোচ্চ ধাপ উল্লেখ করা হয়েছে। ৭.১ অনুচ্ছেদে ১২টি প্রধান সার্ভিসে বিভক্তির সুপারিশের কথা বলা হলেও দেখানো হয়েছে ১৪টি প্রধান সার্ভিস। কমিশনের প্রতিবেদনে এ ধরনের ভুল কাম্য নয়।

অন্যান্য সংস্কার কমিশনের মধ্যে অনেক কমিশনই সমস্যার যতটা গভীরে গিয়ে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন ছিল, ততটা গভীরে গিয়ে সমস্যার পর্যালোচনা করেছে বলে মনে হয় না। যেমন, দুর্নীতি দমন কমিশন বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতি রোধের কি কোনো উপায় খুঁজেছে! বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতিই আর্থিক দুর্নীতির জন্ম দেয়। বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতি বন্ধ না করা গেলে আর্থিক দুর্নীতি কখনো বন্ধ করা যাবে না। বর্তমানে দুর্নীতি সহায়ক যেসব আইন ও বিধিবিধান রয়েছে এবং পার্শ্ববর্তী দেশের চেয়েও নমনীয় যেসব দণ্ডের বিধান রয়েছে, তা কি পর্যালোচনা করে কোনো সুপারিশ করা হয়েছে? দুদকের বুদ্ধিবৃত্তিক ও আর্থিক নিজস্ব দুর্নীতি রোধে কোনো নজরদারি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব রয়েছে কি?

নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবার মনস্তাত্ত্বিক সক্ষমতা সৃষ্টি না হলে শ্যাম নির্বাচনের কালচার থেকে বের হওয়া যাবে না। এছাড়া জনপ্রতিনিধিদের হালুয়া-রুটি খাওয়া বন্ধ করতে পারলে নির্বাচনে দুষ্ট লোকের উপস্থিতি কমে যাবে। বিড়ালকে মাছ পাহারায় রেখে সাধু বানানো যাবে না। বিড়ালকে মাছ পাহারা থেকে দূরে রাখতে হবে। সংস্কার কমিশন কি এ বিষয়গুলো পর্যালোচনা করেছে?

প্রভাবমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক পুলিশ বাহিনী গঠনের ব্যাপারে সংস্কার কমিশনের কাছে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ জনগণ আশা করেছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে দায়সারা সুপারিশ সবাইকে হতাশ করবে। পুলিশের দুর্নীতি রোধে স্থানীয় পর্যায়ে সর্বদলীয় কমিটির কোনো দায়বদ্ধতা না থাকার কারণে তাদের লাগাম টানবে কে? তারা বর্তমান স্থানীয় দালালদের স্থলাভিষিক্ত হয় কিনা, তা নিয়ে জনমনে শঙ্কা থাকবে। এছাড়া সর্বদলীয় কমিটি অত্যন্ত প্রভাবশালী হলে পুলিশের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ারও আশঙ্কা দেখা দেবে।

সব কমিশনই বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতি সম্পর্কে নীরব। বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতি বন্ধ বা হ্রাসের কোনো উপায় ও পদ্ধতি সংস্কার প্রস্তাবে না থাকলে সংস্কার প্রস্তাব চমক সৃষ্টি করতে পারবে; কিন্তু সমাজ, রাষ্ট্র ও জনপ্রশাসনে কোনো ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে বলে মনে হয় না।

মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া : অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞ

প্রথম আলো ১৩-০২-২০২৫

গণভোটে সংবিধান সংশোধনের বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে হতে পারে: আলী রীয়াজ

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা

প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫,

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ*ফাইল ছবি*

গণভোটের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনের বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে আলী রীয়াজ এ মন্তব্য করেন।

নির্বাচিত সংসদ ছাড়াই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী গণভোটে সংবিধান সংশোধন সম্ভব কি না, জানতে চাইলে আলী রীয়াজ বলেন, 'আমরা (কমিশন) সংস্কারগুলো কী কী করতে হবে, সেটা বলেছি। অন্তর্বর্তী সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে কীভাবে করবেন, সেটা ঠিক করবেন। সম্ভব কি না—এই মতামত সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে আমরা দেব না। এটা আমাদের এখতিয়ারের বাইরে।'

গণভোটের যৌক্তিকতার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে আলী রীয়াজ বলেন, দেশে একাধিকবার সংবিধান সংশোধন হয়েছে দুই–তৃতীয়াংশের মাধ্যমে। অর্থাৎ যে দল ক্ষমতায় থাকেন, তারাই সংবিধান সংশোধন করেছেন। অনেক সময় তারা দেশের ৫০ শতাংশ জনগণেরও প্রতিনিধিত্ব করেন না। এর অপব্যবহারের মোকাবিলা করতেই গণভোটের সুপারিশ করা হয়েছে। যাতে কোনো দল ক্ষমতায় থাকলেও জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। অতীতে সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের আগে জনগণের মত নেয়নি।

অভ্যুত্থান–পরবর্তী ছয় মাসে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যের যে পরিস্থিতি, এ অবস্থায় সংবিধান সংস্কারের সুপারিশ বাস্তবায়নের বিষয়ে আলী রীয়াজ বলেন, বিভিন্ন মতপার্থক্য সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংস্কারের ক্ষেত্রে একধরনের ঐকমত্য আছে। এ ছাড়া বহুদিন ধরেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল রাষ্ট্র সংস্কারের আলোচনা করে আসছে। দলগুলো তাদের সংস্কার প্রস্তাবও পেশ করেছে। সংস্কারের রাজনৈতিক দলগুলোর আন্তরিকতা রয়েছে বলেই বিশ্বাস ও আস্থা আছে। বিশেষভাবে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা হ্রাসের বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে।

সংবিধান সংস্কারের সুপারিশে কোটা ও বৈষম্যের ছাপ রয়েছে বলে আলোচনা হচ্ছে উল্লেখ করে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, ১০ শতাংশ তরুণ-তরুণী মনোনয়ন এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনে

অংশগ্রহণের বয়স ২১ বছর করার সুপারিশ নিয়ে আলোচনা ছিল। এখন আন্দোলনকারী ছাত্ররা রাজনৈতিক দল গঠন করতে যাচ্ছে। তাদের সুবিধা দিতেই এ সুপারিশগুলো করা হয়েছে কি না?

এ বিষয়ে আলী রীয়াজ বলেন, ১০ শতাংশ মনোনয়ন বাধ্যতামূলক নয়। রাজনৈতিক দলগুলো যেন তরুণ-তরুণীদের মনোনয়ন দেয়, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তরুণদের অংশগ্রহণের মাত্রা বাড়তে পারে, নতুন নেতৃত্ব তৈরির ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়; আর ২১ বছরের কথা রাজনৈতিক দলগুলো মেনে নিলেও, সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হলেও, তাতে যে এই শিক্ষার্থীরাই মনোনীত হবেন, এ নিশ্চয়তা কে কাকে দিচ্ছে? তিনি বলেন, বিশেষভাবে কোনো একটি রাজনৈতিক দল তৈরি হবে, এই বিবেচনা করে সুপারিশ করা হয়নি।

বহুত্ববাদের সুপারিশ ও প্রধান উপদেষ্টার আহ্বানের পরেও ভিন্নমতের ওপর আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে। এমন বাস্তবতায় বহুত্ববাদ প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জের বিষয়ে জানতে চাইলে আলী রীয়াজ বলেন, ভাষা, সংস্কৃতি, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ধর্ম—সবকিছুর মধ্যেই যে পার্থক্য আছে, সেগুলোকে শুধু স্বীকার বা স্বীকৃতি দেওয়া নয়, সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠার জন্যই বহুত্ববাদিতার কথা বলা হয়েছে। বহুত্ববাদের সঙ্গে ধর্মের ব্যাখ্যা যেভাবে করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এটা সঠিক ব্যাখ্যা নয়। ধর্মের একত্ববাদের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি) গঠনের বিষয়ে জানতে চাইলে আলী রীয়াজ বলেন, বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর কার্যত এক ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা সেখান থেকে বেরোতে চেষ্টা করেছি। এনসিসির ধারণা মূলত ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মোকাবিলা করা।

নির্বাচনের জন্য কী কী সংস্কার গুরুত্বপূর্ণ—জানতে চাইলে রীয়াজ বলেন, সংবিধান সংস্কারের সুপারিশ বাস্তবায়নে একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। অন্যান্য সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলোর মধ্যে যেগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব, সেগুলো শনাক্ত করে সরকারের কাছে দেওয়া হয়েছে। ডিসেম্বরের মধ্যে যে নির্বাচনের কথা হচ্ছে, এর জন্য নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কারের কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নে ব্যবস্থা নিলে ভবিষ্যতে জালিয়াতির নির্বাচন বন্ধ সম্ভব হবে।

এর আগে অধ্যাপক আলী রীয়াজ একটি লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। এতে তিনি বলেন, শক্তিশালী গণতন্ত্র তৈরি এবং এটাকে স্থায়ী করতে হলে ভবিষ্যতে ফ্যাসিবাদী শাসনের আশঙ্কা মোকাবিলার উপায় হচ্ছে ক্ষমতাসীনদের জবাবদিহির জন্য প্রতিষ্ঠান তৈরি, সেগুলোর স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় পর্যায় থেকে শাসনব্যবস্থার সর্বস্তরে নাগরিকদের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা বিধান এবং তাদের প্রতিনিধিত্ব কার্যকর করে তোলা।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে কমিশনের সদস্য সুমাইয়া খায়ের, মুহাম্মদ ইকরামুল হক, ইমরান সিদ্দিকী, শরীফ ভূঁইয়া, এম মঈন আলম ফিরোজী, ফিরোজ আহমেদ ও মুস্তাইন বিল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।